এই সময় সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়ে,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
কাজী নজরুল ইসলাম

মূল সংকট খাদ্যপণ্যে

পণ্য ও পরিষেবা মূল্যের ঊর্ধ্বগামিতা রুখতে সুদের হার বৃদ্ধি তখনই কার্যকরী হতে পারে, যদি অতিরিক্ত চাহিদার দরুণ সেটি হয়ে থাকে। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ঋণগ্রহণে উৎসাহ কমে, ফলে বাজারে চাহিদাও নিম্নগামী হতে থাকে, এবং মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আসে। কিন্তু ভারতে এ মুহূর্তে যে চিত্রটি দেখা যাচ্ছে, তা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির। গত জুলাই মাসে খুচরো মূল্যসূচকের বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৪ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৬ শতাংশ পর্যন্ত খুচরো মুদ্রাস্ফীতিকে ‘স্বাভাবিক’ হিসেবে গণ্য করে, অর্থাৎ সহনশীলতার সেই ঊর্ধ্বসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে মুদ্রাস্ফীতির হার। এটির মূল কারণটি স্পষ্ট— খাদ্যপণ্যের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি। গত বছর জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির হারের ফলে মুদ্রাস্ফীতির হারও বাড়ে, এবং তার সঙ্গে বাড়ে খাদ্যপণ্যের মূল্য। কিন্তু তার পর থেকে খাদ্যপণ্যের মূল্য বেড়েই চলেছে অবিরত। এটি মনে রাখা দরকার যে, পাইকারি মূল্যসূচকের গতিপ্রকৃতি কিন্তু বিপরীতমুখী। জুলাই মাসে যেখানে পাইকারি মূল্যসূচক কমেছে ১.৩৬ শতাংশ হারে, সেই একই সময়ে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মুদ্রস্ফীতির হার ছিল ১৪.২৫ শতাংশ। সাধারণত কিছুটা সময় কাটলে খুচরো মূল্যসূচকের উপর পাইকারি মূল্যসূচকের প্রভাব পরিস্ফুট হয়। অর্থাৎ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়া খুচরো মূল্যসূচকের বাকি অংশগুলিকে নিয়ে ততটা উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। কিংবা অন্য ভাবে বললে, বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি।

খাদ্যপণ্য যে কোনও গড়পড়তা পরিবারের বাজেটের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং নীতি-প্রণেতাদের শিরঃপীড়ার কারণ। কিন্তু সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে যে ব্যবস্থাটি নেওয়া হয়, অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি, সেটি যে এ ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সেটি বোঝা দরকার। গত বছরের মে মাস থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রেপো রেট বেড়েছে ২.৫ শতাংশ বিন্দু, অল্প সময়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি। কিন্তু তার সম্পূর্ণ প্রভাব এখনও আর্থিক বাজারে দেখা দেয়েনি, আমানত ও ঋণে সুদের হার বাড়লেও তা রেপো রেট বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক নয়। অতএব এই মুহূর্তে রেপো রেট যেন আর না বাড়ে, সেটি নিশ্চিত করা দরকার। বরং বলা সমীচীন নয়, খাদ্যদ্রব্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে কোনও গড়পড়তা পরিবারই অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনে বাধ্য হয়, ফলে কার্যত চাহিদা কমতে থাকে, যার পাইকারি মূল্যসূচকের নিম্নগামিতার অন্যতম সম্ভাব্য উৎস। মূলত খাদ্যদ্রব্যের জোগানের স্বল্পতার দরুণ মূল্যবৃদ্ধির সংকট দেখা দিয়েছে। এটি সমাধানের চাবিকাঠি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। তাদেরই যা করার করতে হবে।

সাবধানের মার নেই

ভরা বর্ষায় খাল-বিল, নদী-নালার অবস্থা কেমন দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কলকাতা শহর এবং লাগোয়া শহরতলিতে দ্রুত নগরায়নের পরও দু’পা অন্তর পুকুরের দেখা মেলে। এর অনেকগুলিই বহু প্রাচীন, এবং অনেককাল পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পুরসভার নলবাহিত পথে মেটার পরও, নিয়মিত খনন ছাড়াই যথেষ্ট গভীর। বাংলায় এই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি জলাধার এবং প্রাকৃতিক জলসম্পদের পরিসরগুলি সব বয়সি মানুষের আহ্লাদ মেটানোর জায়গা। একা অথবা দল বেঁধে, সাঁতার জেনে অথবা অথবা আগে কখনও জলে নামার কোনও রকম অভিজ্ঞতা ছাড়াই তারা হাঁটু জল থেকে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনটিই হয়ে আসছে, এবং হলফ করে বলা যায়, আগামী বেশ কয়েক মাস এর কোনও ব্যত্যয় ঘটবে না। যাদের সাঁতার জানা নেই, তাদের পরিবারের লোকজন জলে নামার বিষয়ে কতখানি সাবধান করে দেয়, সে বিষয়ে জোরালো সন্দেহের অবকাশ আছে। শহরাঞ্চলে বেশির ভাগ জলাশয় ঘিরে দেওয়া হয়েছে। তবে যাদের মৃত্যুভয় নেই, তাদের কাছে ওই বাধা কখনওই দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। অতএব সলিল সমাধি এবং অকারণ মৃত্যুর শোক ললাটলিখন বলাই যেতে পারে। যদিও সামান্য সাবধানতা এই মৃত্যুগুলো ঠেকানোর পক্ষে যথেষ্ট।।

অসংখ্যা

১২৮১৫০

(এক লক্ষ আঠাশ হাজার দেড়শো) মেট্রিক টন— ২০১৯-২০ সালে কলকাতা বন্দর থেকে মাছ ও মৎস্যভিত্তিক পণ্যের রফতানির পরিমাণ

দিনকেদিন

২২ অগস্ট

১৬৩৯: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজপতনম এবং চেন্নাপতনম গ্রাম দু’টি যুক্ত করে মাদ্রাজ নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। এই দিনটিকে ‘মাদ্রাজ দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়।

১৯১৫: শম্ভু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায়। তাঁর পরিচালনায় নাটকগুলির মধ্যে ‘রক্তকরবী’, ‘রাজা অয়দিপাউস’, ‘দশচক্র’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে পান পদ্মভূষণ পুরস্কার।

বৃত্তি ও মনের নিয়ন্ত্রণ

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

বোধিবৃক্ষ

ব্রহ্ম চক্রের বিবর্তন ধারায় এক বিশেষ পর্যায়ে এসে মনের উদ্ভূতি। বিভিন্ন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টিধারার চলার পথের এক বিশেষ অবস্থার নাম মন, আর তাই তাতে রয়েছে এক বিশেষ ধরনের সংবেগ যাকে কোন না কোন উপায়ে অভিব্যক্ত হতেই হবে। এই অভ্যন্তরীণ সংবেগের অভিব্যক্তির জন্যে মনকে কতকগুলো চিত্তগত অভিব্যক্তির আশ্রয় নিতে হয়। এদের বলা হয় মনের বৃত্তি। যেমন ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি। অর্থাৎ বৃত্তিকে মনের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি হিসেবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। মানসিক স্তরে এই বৃত্তিকে বলা হয় অভিব্যক্ত ভাবপ্রবণতা। আর এই সেন্টিমেন্ট বা ভাবপ্রবণতা যখন দেহনিম্নস্থ গ্রন্থিগুলোকে নিচের দিকে প্রভাবিত করে তাদের বলা হয় বৃত্তি। এখানে দেহ নিম্নস্থ গ্রন্থি বলতে সহস্রারচক্র ও আজ্ঞাচক্র বাদ দিয়ে দেহস্থিত অন্যান্য গ্রন্থিদের বোঝাচ্ছে। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চান যে বৃত্তি জিনিসটা জন্মাচ্ছে সেন্টিমেন্টের পরের ধাপে। অর্থাৎ সেন্টিমেন্ট তখন অভ্যাসগত হয়ে পড়ছে তখন প্রবৃত্তির উদ্ভূতি ঘটে। এটা একটা সিদ্ধান্তিক সংজ্ঞা। সাধক, যিনি এক বৈবহারিক মনস্তত্ত্ববিদ, তিনি কিন্তু সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে প্রবৃত্তি জিনিসটিও একটা সেন্টিমেন্ট যা দেহ-নিম্নস্থ গ্রন্থিগুলোকে প্রভাবিত করে থাকে। এই গ্রন্থিগুলো হল দেহের ইন্দ্রিয়সমূহের উপকেন্দ্র। এই ইন্দ্রিয়সমূহের মুখ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রটি রয়েছে মানব মস্তিষ্কে। (‘তন্ত্রই সাধনা সাধনাই তন্ত্র’ থেকে গৃহীত)

সন্দেহ অযৌক্তিক নয়, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে শাসকের যে ভাবনা, তার নিশানা মুসলমান সমাজ

নারী সংগঠনগুলি বিকল্প রূপরেখা পেশ করুক

ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন সব মহিলাকেই নিপীড়ন করে। একক দেওয়ানি বিধির ইস্যুটি হিন্দুত্ববাদীদের ছেড়ে না দিয়ে সবার সোচ্চার হওয়া দরকার। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

অন্য ভুবন। ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন ব্যক্তিগত আইন নিয়ে তাদের বিকল্প ভাবনা জানিয়েছে কেন্দ্রকে, সরকার নিশ্চুপ *বিসিসিএল*

কেরালা বিধানসভা পাস করেছে যে তারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করবে না। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাস না হলেও, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে তারা এর বিরোধী। অন্য দিকে, বিজেপি-শাসিত উত্তরাখণ্ডে নাকি পুরো খসড়া তৈরি, মধ্যপ্রদেশ আর মহারাষ্ট্রও নাকি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছে। এই বিজেপি-শাসিত বনাম অ-বিজেপি-শাসিত তর্জায় মেয়েরা কোথায়? মেয়েদেরই তো এগিয়ে এসে বলা প্রয়োজন, কী আইন তারা চায়। সেই ভাবনার একটা প্রকাশ সমান পারিবারিক আইনের দাবি।

শাসকের ভাবনা

গেরুয়া বা ত্যাগের রং যেমন হিন্দুত্ববাদীদের দখল করতে দেওয়া হয়েছে, তেমনই যদি ইউনিফর্ম সিভিল কোড শব্দের বাংলা করি একক দেওয়ানি বিধি (এদেবি), তা হলে সেই শব্দটিকেও হিন্দুত্ববাদীদের দখল করতে দেওয়া হয়েছে। নারী সংগঠনরা এখন এদেবি শব্দটাকেই ছোঁয় না, তারা বলে ইকুয়াল ফ্যামিলি কোড, ভাবনার দিক থেকে তা যতই এদেবি-র কাছাকাছি হোক না কেন। এই ২ জুলাই ২০২৩ ভোপালে এদেবি আসছেই বলে প্রধানমন্ত্রী হুঙ্কার ছাড়লেও ভোটের হিসেব কষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও লোকসভার আইন ও বিচার কমিটির সভাপতি সুশীল কুমার মোদী বলেছেন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, নাগাল্যান্ড, আসাম, মণিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, মিজোরাম আর অরুণাচল প্রদেশের যেখানে সংবিধানের ৩৭১ ধারা কার্যকর, সোজা ভাষায় যথেষ্ট সংখ্যক জনজাতি আছে, তারাও এদেবি-র আওতায় আসবে না। শিখদেরও একই রকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যদিও কী করে তা দেওয়া যায় জানি না, কারণ শিখরা এখনও বৌদ্ধ, জৈনদের মতোই পারিবারিক বিষয়ে হিন্দু বলেই গণ্য, যদিও তারা এই ‘হিন্দু’ পরিচয়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বিবেচনার আবেদন জানিয়েছে। পড়ে রইল হিন্দু আর মুসলমান। তা হলে কি শাসক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য মুসলমান পুরুষদের বহুবিবাহ বন্ধ করা? এই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। মুসলিম বিবাহ (বিচ্ছেদের পর অধিকার) আইনে সংশোধনী এনে এক নিঃশ্বাসে তিন তালাককে দণ্ডযোগ্য করা হল, তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, কারণ আর কোনও ধর্মেই একতরফা ভাবে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিলে কেউ ‘অপরাধী’ বলে দণ্ডযোগ্য হয় না। আর বহুবিবাহের কথা যদি বলতেই হয়, পঞ্চম জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা (২০১৯-২০) দেখিয়েছে তাদের নমুনায় বহুবিবাহ সব গোষ্ঠীতেই রয়েছে, কম বা বেশি। তা হলে আলাদা করে মুসলমান সম্প্রদায়ের বহুবিবাহের কথা কেন বলা হচ্ছে?

নারী সংগঠনদের ভাবনা

বেশির ভাগ নারী সংগঠন ধরেই নিয়েছে যে শাসকের এদেবি আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাই তারা জানতেও চাইছে না শাসকের ভাবনায় এদেবি-র চেহারাটা ঠিক কেমন। বরং তারা স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে এই আইন কমিশনের পূর্ববর্তী একুশতম আইন কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশে, সেটাও তো বর্তমান শাসক দলের উদ্যোগেই তৈরি হয়েছিল। সেই রিপোর্ট লিখেছিল ‘এই মুহূর্তে এদেবি প্রয়োজনীয় বা কাম্য কোনওটাই নয়, বরং তা জাতীয় সংহতিতে বিপরীত প্রভাব ফেলতে পারে’। সেই সঙ্গে লিখেছিল ‘আইন পরিবর্তন না করে ব্যক্তিগত আইনে সংশোধনী আনা উচিত’। নারী সংগঠনরা প্রশ্ন তুলেছে, তা হলে কি ২০২৪ সালে নির্বাচন বলে হঠাৎ আবার এদেবি নিয়ে বিজেপি-র টানাটানি শুরু হল? আর এই ২২তম আইন কমিশন যে ভাষায় জনগণের থেকে সুপারিশ চেয়েছে, সেটাও নারী সংগঠনদের কাছে সন্দেহজনক— ‘জনগণ আর স্বীকৃত ধর্মীয় সংগঠনদের থেকে’। জনগণ তো বোঝা গেল, কিন্তু ধর্মীয় সংগঠন আসে কোথা থেকে? ব্যক্তিগত আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি তো এই কারণেই যে, তা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে মেয়েদের সমান চোখে দেখে না। পারিবারিক আইনের বিকল্প কোনও রূপরেখা, যা সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা উপস্থিত করা হল না। শাহ বানো মামলা, তার পরে রাজীব গান্ধী সরকারের মুসলিম নারীর বিচ্ছেদের পর অধিকার আইন নিয়ে আপত্তি জানানো পর্যন্ত নারী সংগঠনরা এদেবি-র দাবির পাশে ছিল। এমনকী ১৯৯৫ সালে মুম্বইয়ের একটি আলোচনাসভায় একটি খসড়া প্রস্তাবিত হয়। ব্যস, ওই পর্যন্তই। তার পরে হিন্দুত্ববাদীদের এদেবি-র দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠা নারী সংগঠনদের পিছু হঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল।

◀ **ছাড়-পত্র।** শিখরা একক দেওয়ানি বিধির আওতায় আসবে না, আশ্বাস দেওয়া হয়েছে

পরিবার ও সমতা

যদি একটি পরিবার সত্যিই লিঙ্গসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সদস্যদের পরস্পরের প্রতি কী কী দায়িত্ব আর অধিকার থাকবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়া এখনই দরকার। নারীবাদীরা নিজেদের খসড়া সামনে আনলেই হিন্দুত্ববাদী ভাবনার থেকে নিজেদের পৃথক করতে পারবে। বিকল্প রূপরেখার প্রয়াস হিসাবে লিখতে হয় নারীবাদী আইনজ্ঞ সৌম্যা উমার প্রস্তাব আর বিধি সংগঠনের প্রস্তাবিত সমান পারিবারিক আইনের পূর্ণাঙ্গ খসড়া। এরা সবাই বলেছে প্রথমত, পরিবারের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করতে হবে, অন্য লিঙ্গ আর যৌন পছন্দের মানুষদেরও সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ ছাড়াও গুজরাতের মৈত্রী কাড়ার, রাজস্থানের নাতা, কেরালার সম্বন্ধম, হরিয়ানার কারেভু বা চাদর আন্দাজি, ঝাড়খণ্ডের ধাকুর মতো প্রচলিত বিয়ের বাইরের সম্পর্কগুলিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিয়ের বয়স সকলের ক্ষেত্রেই ১৮ হতে হবে, সেটাই যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কতার মাপকাঠি। কিন্তু এ দেশে ১০ বছরের নীচে বিয়ে হয়, এমন ১২০ লক্ষ মেয়ের ৮৪% হিন্দু। তাদের বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না, কিন্তু সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে সেই বিয়ে স্বীকার করবে কি না, সেই ব্যবস্থা স্পষ্ট করে আইনে রাখতে হবে। তৃতীয়ত, জাতপাত, শ্রেণি বা ধর্মের বাইরে বিয়ে হলেও সব শিশুকেই বৈধতার স্বীকৃতি আর সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিতে হবে। চতুর্থত, সমস্ত নারী-পুরুষের সন্তান দত্তক নেওয়ার অধিকার থাকবে এবং মা-বাবা দু’জনেই অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। পঞ্চমত, সম্পত্তির সমান অধিকার থাকবে, পুত্র-কন্যার মধ্যে ভেদাভেদ করা চলবে না। উইল না থাকলে মেয়েরা সমান উত্তরাধিকারী হয় হিন্দু আইনে, সেখানে উত্তর ভারতে নিয়ম করে ভাইদের পক্ষে ‘হকত্যাগ’ বলে লিখে দিতে বাধ্য করাকে বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। পঞ্চমত, প্রতিপালকের প্রতি সবার সমান দায়িত্ব থাকবে। ষষ্ঠ, বিচ্ছেদের ভিত্তি হিসাবে ‘পরস্পরের অ-বনিবনা’কে যথেষ্ট কারণ ধরতে হবে। এই সব প্রস্তাব কার্যক্ষেত্রে কতটা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, তা বাস্তবই বলবে। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা মেয়েদের এত ‘অধিকার’ দিতে ভাববে।

মুসলিম মেয়েদের ভাবনা

১৯৮৩ সালে শাহনাজ শেখ আওয়াজ-এ-নিশান তৈরি করেন, সুপ্রিম কোর্টে ১৯৩৭-এর শরিয়ত আইনের বেশ কিছু ধারা সংবিধানের প্রতিশ্রুত সমতার বিরোধী বলে মামলা করেন, তার শুনানি এখনও হয়নি। ১৯৯৯-এ মুসলিম উইমেন্স নেটওয়ার্ক তৈরি করে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে এক নিঃশ্বাসে তিন তালাক ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা, দত্তক আর অভিভাবকত্বের সমান অধিকার, খোরপোষ, এবং সম্পত্তিতে সমান অধিকার দাবি করে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে জনমত তৈরি করতে শুরু করেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ড আদর্শ নিকানামা তৈরি করলে তারা প্রেস কনফারেন্সে তা ছিঁড়ে ফেলে বলে যে এই বোর্ড স্বনিযুক্ত, এরা মুসলিম মেয়েদের অভিভাবক নয়। অন্য দিকে, ২০০৭-এ মুসলিম মেয়েদের সমান অধিকারের দাবি নিয়ে ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন গড়ে ওঠে। তাদের মূল দাবি মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পঞ্জিকরণ, নয়তো ব্যাখ্যার বিষয়টা কাজি আর ইমামদের হাতেই থেকে যাচ্ছে। শায়রা বানু যখন এক নিঃশ্বাসে তিন তালাককে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করলেন, তখন ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন, বেবাক কালেক্টিভ ইত্যাদিরা অন্যান্য নারী সংগঠনদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারীর সাক্ষর সংগ্রহ করে, যার ফল ২০১৯ সালে এক নিঃশ্বাসে তিন তালাক নিষিদ্ধ করে মুসলিম নারী (বিবাহের অধিকার সুরক্ষা) আইন। ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের এক পূর্ণাঙ্গ খসড়া করে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছে। সেই খসড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভাবেনি কেন?

আজ মুসলিম মেয়েদের সমতার আন্দোলন দু’টি সমান্তরাল ধারায় বইছে: ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পঞ্জিকরণ চাইছে, অন্য দিকে মুসলিম উইমেন্স রাইটস নেটওয়ার্ক সমস্ত মেয়েদের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ লিঙ্গসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমান পারিবারিক আইন চাইছে।

ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন সমস্ত মেয়েদের নিপীড়ন করে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চুপ থাকা নয়, আজ সবার সোচ্চার হওয়াটা জরুরি।

লেখক অর্থনীতির শিক্ষক ও সমাজকর্মী

প্রতি সম্পাদক

যাদবপুর যে ব্যতিক্রমী, তা তারা প্রমাণ করুক

বেপরোয়া দাদাগিরির দৌরাত্ম্যে স্বপ্নদীপের মতো প্রান্তিক বঙ্গের একটি সদ্য-যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর চাউর না হলে মৌরসি-পাট্টা গেড়ে বসা ‘র‍্যাগিং’ নিয়ে এত হইচই হত কি? যাদবপুর ব্যতিক্রম নয়। বহু জায়গা। চলে নবাগতদের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব তথা ‘ইন্ট্রো’র নামে অসভ্যতা। পরিসংখ্যান দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে (‘একটি মৃত্যুসংবাদ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ’, ১৮-৮)।

স্বপ্নদীপ অনেক আশা নিয়ে পড়তে এসেছিল ‘এলিট’ যাদবপুরে। উল্লিখিত নিবন্ধে ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত জমা পড়া র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ শিউরে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও, কত যে নির্যাতিত তাদের র‍্যাগিংয়ের ঘটনা সর্বসমক্ষে আনে না, তা গোপনই থাকে। এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত, সুচাকুরে, দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চাকুরি বা গবেষণারত যাদবপুরের প্রাক্তনীরাও কি র‍্যাগিংয়ের শিকার হননি? কিন্তু, স্বপ্নদীপের কাহিনি প্রকাশ্যে আসা ইস্তক যে ভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইমলাইটে আসছে, প্রচারিত হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে মূলধন করে নিজেদের উপস্থিতি জাহির করতে চাইছে, তাও বিস্ময়কর। রাজনীতির চক্করে এবং দিবারাত্রির বোকা-বাক্সীয় কাব্যে আলোচিত বিষয়, বিভিন্ন গুণিজন-মুখনিঃসৃত মত বিনিময় যাদবপুর সংক্রান্ত। ‘আমাদের সময়ে এতটা র‍্যাগিং হত না’, ‘কেন প্রাক্তনীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে বহাল তবিয়তে রাজ্যপাট চালায়?’, ‘প্রশাসন কি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল?’ ইত্যাকার প্রশ্নে জেরবার সান্ধ্য-আসর। জানা কথা, যে চ্যানেল যতটা মোক্ষম কায়দায় স্বপ্নদীপের হত্যা বা আত্মহত্যাকে উপস্থাপিত করতে পারবে, তাদের টিআরপি তত বাড়বে।

‘র‍্যাগিং’ এবং ‘বুলিইং’ নবাগতদের নির্যাতনের দ্বিবিধ কায়দা। অনেকেই বলেন, দাদাদের অবদমিত কামনা-বাসনা মেটানোর পন্থা র‍্যাগিং। মানসিক হেনস্থা ‘বুলিইং’। যে পন্থাগুলো দাদাদের আমোদ বিলোয়, নবাগত তাতে অভ্যস্ত নয়। সে কেন গাঁজা খাবে, বিয়ার পান করবে, অন্তর্বাস খুলে হাঁটাহাঁটি করবে, গান গাইতে নাচ করাতে বাধ্য করা হবে তাকে? আরও অশ্লীল পর্বগুলি অকথিতই থাকে। থাকবে। নইলে স্বপ্নদীপ নগ্ন অবস্থায় আত্মহননের (!) পন্থা বেছে নিত কি? প্রয়োজন নবাগতদের সমবেত প্রতিবাদ এবং এককাট্টা হয়ে দাদাদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু, সর্ষের মধ্যে যে সর্বদাই ভূতের অস্তিত্ব!

অন্যত্র অবাধে র‍্যাগিং চলে বলে যাদবপুর ব্যতিক্রমী হবে না? ছাত্র রাজনীতিতে জেএনইউ সর্বাগ্রগণ্য, সেখানে যদি ‘র‍্যাগিং’ অস্তিত্বহীন হয়, তবে ‘হোক কলরব’ থেকে ‘হোক চুম্বন’ দাবি তোলা যাদবপুর কেন র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে না? সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরদারি। বিভিন্ন বিষয়ে পথদ্রষ্টা যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের সেই প্রমাণ দেওয়ার সময় এসেছে, রাজ্যে ‘কম পয়সায় ভালো পড়াশোনার সুযোগ’ যাদবপুরেরই আছে।

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী,
কলকাতা ১২৫

সুখী রোজদিন

এল বরষা যে সহসা...

কখনও মেঘ, কখনও রৌদ্র। সঙ্গে অঝোর ধারায় মাঝেমধ্যেই দমকায় ভিজিয়ে দেওয়া বৃষ্টি। এক পশলাতেই কোথাও জলে জলাক্কার। কোথাও বা আবার এক মাইল দূরেই শুকনো খটখটে। ছাতা নিয়ে বেরোনো সমীচীন ছিল হয়তো। কিন্তু কে বলবে, সকালের খটখটে রোদ দেখে এত বিষ্টি হবে। ফলে মন কোথায় ময়ূরের মতো নেচে উঠবে, তা না, হয়েছে একেবারে উল্টো।

এই বর্ষাকেই এক সময়ে কত না ভালো লাগত। জল ছপ ছপ করে কেডস ভিজিয়ে ইশকুলে যাওয়া, ভরা বর্ষায় রেনি ডে হলে বাড়ি চলে আসা, সারা দিনের মজা, দিব্যি আনন্দ ছিল মনে। আর আজ? প্রবল বর্ষা মানে, কাজে বেরোব কী করে? ফেরার সময়ে রাস্তায় এক হাঁটু জল জমলেই চিত্তির। জুতো গেল, পা গেল, বিপর্যয় যেন। যারা অবশ্য বাড়িতে বসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, চা-মুড়ি-খিচুড়ি সহযোগে, তাদের প্রতি ঈষৎ হিংসুটে হওয়া।

অথচ জুনের গরমে এই আমরাই এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য কত কাতর হয়েছি। আকাশে একটুকরো মেঘ দেখলে কী আনন্দেই না নেচে উঠেছে মন! তা হলে সেই অতি কাঙ্ক্ষিত বরষার উপর এমন প্রবল বর্ষামধ্যে হঠাৎ কী ভাবে ভরসাহীন হয়ে পড়লাম আমরা? উত্তর সহজ। আমাদের জীবনযাত্রা। ছেলেবেলার ‘ছুটি’ নেই, ‘আলস্য’ করার অবকাশ নেই। রয়েছে এক দৌড়। বর্ষাকে তাই আমাদের এখন দরকার লাগে মাত্র, তাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে অপারগ আমরা। আমাদের চারপাশ গেছে বদলে। প্রতিদিন ‘উন্নত’ হতে হতে শহর আর বর্ষাকে ধারণ করতে পারে না। ফলে জল জমে। প্রতিদিন ‘কাজ’ করতে করতে আমরা আর বৃষ্টি ‘দেখতে’ পারি না, ‘ভিজতে’ পারি না। ফলে বিরক্তি তৈরি হয়। অথচ বৃষ্টি যে আমরা ভালোবাসি, তা তো আমরাই জানি সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেই ভালোবাসা ‘যাপন’-এর উপায় নেই! কে বলতে পারে, সেই ভালোবাসাটুকু যাপন করতে পারলে আমাদের মন আর একটু ভালো থাকত না!

কৃষ্ণেন্দু চাকী

গত বৃহস্পতিবারের নির্বাচিত ক্যাপশন: **‘একটুকু কথা শুনি’**

পাঠিয়েছেন: বৈশালী মুখার্জি, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

বিষয়টি সম্পর্কে তিন শব্দের ক্যাপশন মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন **‘সুখী রোজদিন’**। মেল ঠিকানা: eisamay@timesgroup.com

সমান্তরাল

প্রবীণের স্বীকারোক্তি

মানছি আমি প্রবীণ। মানছি আমি এই প্রাণশক্তির দুনিয়ায় কিছুটা এক পাশে জমে থাকা তিমির। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চের নির্মিত সৃষ্টির বাইরে তো আর কিছু নই। তাই এই পৃথিবীতে আমারও কিছু বলার আছে। এই ভুবনে আমারও দিয়ে যাওয়ার আছে কিছু।

না না, তা হয়তো আপনাদের মতো সে রকম ঝোড়ো উদ্দাম নয়। কিন্তু আমার যা কিছু শান্ত, তার সত্যতা কি ওই ঝঞ্ঝার থেকেও প্রবল নয়?

ভাবুন, একজন মানুষ তাঁর জীবনের উপান্তে এসে পৌঁছলে যে অভিজ্ঞতার ডালিটি উপুড় করে দিতে পারে চরাচরে, তা আপনাদের মতো জীবনকে সবে পর্যবেক্ষণ করতে শেখা মনুষ্যকুলের মধ্যে কোথায়? কোথায় আপনাদের অভ্যন্তরে সেই আদ্রর্তা, যা পরম আঘাতেও ক্রোধ নয়, বরং ঝরে পড়ে স্নেহ হয়ে। বলুন তো পৃথিবীকে মসৃণ গতিতে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ কি এক অনিবার্য উপাদান নয়? এ নয় কি এমন এক মহানুভবতা যার কোলেই আপনাদের ওই মস্ত বেড়ে ওঠা?

আসল কথাটি হল নিজেকে আরও একবার প্রমাণ করা। অপাংক্তেয়ও যে পংক্তিভুক্ত হতে পারে, তা সারা দুনিয়ার কাছে হাট করে দেওয়া।

হ্যাঁ, বেড়ে ওঠার কথায় আবার মনে পড়ে গেল, আজকাল কিন্তু পাশাটি দিব্যি উল্টে গেছে ভাই। এখন আমরা অচল হয়েও যেন আর ততটা অচল নই। এ যেন আমাদের তরফ থেকে আপনাদের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়া এক চ্যালেঞ্জ।

একেবারে বেদম হয়ে যাব তবু পাহাড়ের চুড়োয় ওঠা থেকে বিরত হব না। রীতিমতো খাবি খাব তবুও সমুদ্রের অতলে ডুব দেওয়া থেকে নিজেদের নিরস্ত করব না। এবং এ সব কোন বয়সে? ষাট, সত্তর, না, আমাদের কাছে আর কোনও প্রতিবন্ধক নয়। কারণ আমরা বুঝে গেছি, চ্যালেঞ্জটা তো গৌণ, আসল কথাটি হল নিজেকে ওই আরও একবার প্রমাণ করা। অপাংক্তেয়ও যে ইচ্ছে করলে পংক্তিভুক্ত হতে পারে তা দুনিয়ার কাছে হাট করে দেওয়া।

এর পরেও বলবেন আমরা এই পৃথিবীর জঞ্জাল? তা হলে সারা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা মৃত্যুর আগে কী প্রবল ভাবেই না বাঁচতে শিখে গেছি। মরণ অনিবার্য মেনে নিয়ে কী ভীষণ ভাবেই না জেনে গেছি শেষবারের মত ঘুরে দাঁড়ানোয়। কেন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে পৃথিবীর নানান প্রান্তে আমাদের নিজেদের নিয়ে সেলিব্রেশন আপনাদের চোখে পড়ে না? সে কি শুধুই সাময়িক আবেগ? ‘স্পর্ধার’ আঁচ কি তাতে পাওয়া যায় না আজও?

না, অনেক কথা বলা হল। এ বার বরং বচনে দাঁড়ি দিই। মুখে যতই বলি, দিনের শেষে আমরা তো সেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোই! কেমন ভাবেই বা ঠিক আগের মতো হয়ে যাব? এতগুলো শব্দ খরচ শুধু এই জন্যই যাতে শেষবেলায় ভাঙা হাটে যেন একটু সম্মান, ভালোবাসা আর মমত্ব জোটে এতটুকু। একাধিক বিশ্ব প্রবীণ দিবসটুকু পার করে এসে বিশ্বাস করুন আমাদের চাহিদা বলতে তো ব্যস, এইটুকুই!

সঞ্জয় ভুঁইয়া

শঙ্কর & আচার্য

বিল ওয়াটারসন